গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

সব কিছুই সময়ের সাথে বদলায়, তা সে ঋতু বা সরকার – যাই হোক না কেন... একদিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। হাল্কা-ভারী বর্ষণের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ভারতে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছে। এবারে বিপক্ষ দলও বেশ মজবুত। এখন যেটা দেখা প্রয়োজন, তা হলো – দেশের উন্নতির বদলে যেন অবনতি না ঘটে। যা হোক, এ বছর মাত্রাধিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায়, সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

ত্রৈমাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩
জুলাই ২০২৪

কলম হাতে

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, অমিত নাগ, সামিমা খাতুন, মালা মুখার্জী, সুধীর বরণ মাঝি, রাজশ্রী দত্ত এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

হাতে ক্ষমতা থাকলে মানুষ যে কিভাবে লোভী হয়ে ওঠে, তার নিদর্শন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার কার্যকলাপে। এটা খুবই দুঃখজনক যে এক অযোগ্যা কন্যা বঙ্গবন্ধুর নামে চিরকালের জন্য কলঙ্ক লেপন করে দিয়েছে তার অদ্ভুত আচরণে।

তিন বছর শুনানির পর, কোন যুক্তিতে যে ওখানকার হাইকোর্ট মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরির ৩০% আসন সংরক্ষণ করার রায়টি দিলো – তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাঁদের সন্তানদের ক'জনেরই বা নতুন করে চাকরিতে ঢোকার বয়স আছে এখন? মুক্তিযুদ্ধে এখনকার দ্বিতীয় প্রজন্মের কিরকম যোগদান ছিল? এটাতো শুধুমাত্র লোভী মানুষদের এক স্বার্থপর অভিপ্রায়। সুপ্রীম কোর্ট চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত না করে, এই অযৌক্তিক ব্যাপারটাকে নাকচ করার প্রয়াস নিলে ভাল করত।

দুর্বল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ছাত্র-জনতার রোষ ঠেকানো যায় না। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে, বেশ কয়েকটি মৃত্যুর পরও, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং আরও রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছে শেখ হাসিনা। আগে কী?!

১৯৭৫ সালের মতোই কি আরও একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন অপেক্ষা করে আছে বাংলাদেশের জন্য?! ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

বই

নর্মদা পরিক্রমার পথে – ডাঃ অমিত চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থলঃ জাগরী পাবলিকেশন প্রা. লি.

কলেজ স্ট্রিট ইষ্ট, ব্লক ৪, কলকাতা ৭০০০৭৩

দূরভাষঃ +৯১ ৮০০১১ ৩২৮০৯

কলম হাতে

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ **সন্ধ্যার দক্ষিণেশ্বর মন্দির...**

চিত্রগ্রাহকঃ **সব্যসাচী দত্ত**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/
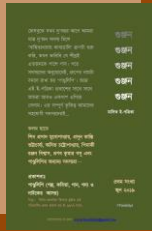
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

অভিন্ন

সুধীর বরণ মাঝি

নারী আর
প্রকৃতি
যেন মুদ্রার
এপিঠ আর ওপিঠ।
সৃষ্টির উল্লাসে
এক মূর্ত প্রতীক।
সৌন্দর্য সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য
সহনশীল গভীরতার
প্রাণপণ চেষ্টা।
শত আঘাতেও আগলে
রাখার লড়াই
আমাদের বাঁচাবার।

নারী আর প্রকৃতি
যেন সৃষ্টির একই ধারার
দুটি পুষ্প
জাগতিক সকল সুখ।

পরম মমতা অনুরাগ
জীবনের ছায়াতলে
ত্যাগের মহিমায়।

তবুও আমরা বিষাদ করে
তুলি, অশান্ত করে তুলি
নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থে
ভুলে যাই সব আছে যত
তাদের আরোপন। ■

বিশেষ ঘোষণা

‘গুঞ্জন’-এর অক্টোবর সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণের অন্তিম তারিখ সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৪।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

বাদল-দিন

সামিমা খাতুন

জা শাওনে,
পড়ে কি
মনে,
পুরানো সেই দিন?

থৈথৈ জলে,
ভাসে হেলে-দুলে,
কাগুজে নৌকা, রঙিন।

স্কুলে যেতে,
ভেজে জামা-ফিতে,
হঠাৎ পাওয়া ছুটি...

স্মৃতিতে তাজা,
দুপুরে খাবার মজা
খিচুড়ি-ইলিশ জুটি।

বৃষ্টি শোনায়,
অজানা আপন ভাষায়,
হারানো লোক-গীতি।

ধারা ঝিরিঝিরি,
সাঁঝের আলো-আঁধারি,
ধরায় ভূতের ভীতি।

রাতের বেলায়,
উদাস হিমেল হাওয়ায়,
অচেনা মায়াবী টান।

পরম আবেশে,
পাড়ি ঘুমের দেশে,
সাথী প্রিয় গানগুলি।। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ রূপমতি...

শিল্পীঃ সঞ্জনা দাস □ বয়সঃ ১৬ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

বাংলার বিচিত্র শব্দ 'মাল'

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

মাঝেমাঝে মনে হয় বাংলা ভাষাটা যেন একটা পাহাড়ের মতো উঁচু উর্বর, নরম টিলা, আর এক একটা শব্দ যেন এক একটা উদ্ভিদ। বিশাল উর্বর ভূমির ওপর যেমন কোন কোন উদ্ভিদ তাদের নিজস্ব প্রাণশক্তি বলে বাকীদের পরাস্ত করে নিজেদেরকে পরিণত করে ফেলে মহীরুহতে – আর মাটি ফুঁড়ে চারিদিকে নিজেদের শিকড় বিস্তার করতে সক্ষম হয়, ঠিক তেমনই কিছু কিছু শব্দ যেন তাদের নিজস্ব মহিমায় এই বাংলা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন কোটরে, বাকীদের বিদায় করে, অবিরাম নিজেদের প্রবল প্রভাব বিস্তার করে চলেছে...

হঠাৎ এমন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কেন লিখতে বসলাম তার একটা পটভূমি আছে। এই গত শনিবার অফিসে হঠাৎ আমার এক সহকর্মিণী তাঁর কম্পিউটারের কিছু ফাইল – যেগুলো আপাতত অপ্রয়োজনীয় তা দেখিয়ে বললেন, "এই 'মাল'গুলোকে কি করি বলুন তো?"

'মাল' শব্দটি সচরাচর মেয়েদের মুখে শোনার অভ্যাস আমার নেই, তাই ওনার বাক্যটি যেন আমার কানে ছোবল মারলো।

চট করে কিছু উত্তর না দিয়ে, আংশিক ভ্রূকুঞ্চনের সাথে আমি ওনার স্ক্রীনের দিকেই চেয়ে রয়েছি, এমন সময় উনি আবার বললেন, "এখন ডিলিট করে দিচ্ছি, পরে দরকার হলে আবার ক্রিয়েট করে নেব – কি বলেন?" ওনাকেতো মৃদু কণ্ঠে বেশ বলে দিলাম, "ইয়েস ইয়েস।" কিন্তু ঐ 'মাল' শব্দটা আমার কান জুড়ে বাজতে লাগলো।

আজকালকার কনিষ্ঠ সহকর্মীরা তো আর বয়সের তোয়াক্কা করেন না, বড়দের সামনেই তাঁদের ঠাট্টা, ইয়ারকি, ফাজলামি ইত্যাদি সর্বক্ষণ চলতে থাকে। পূর্বোক্ত ভদ্রমহিলার সাথে কথা শেষ করে সবে নিজের স্ক্রীনে চোখ রেখেছি। পিছনের রো থেকে দুই জুনিয়রের কথোপকথন কানে এলো।

একজন আর এক-জনকে ডেকে বলছে, "আজতো শনিবার, 'মাল' খেতে যাবি নাকি? আমরা পারিজাতে যাচ্ছি।"

দ্বিতীয় ছেলেটির জবাব, "শনিবারও দেখা না করলে আমার 'মাল' আমাকে স্যাক করে দেবে গুরু। ওকে নিয়ে আজ শপিংএ যেতেই হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে পুরো জুনিয়রদের গ্রুপের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেলো, একজনতো আবার তার হাসি চাপতে গিয়ে জোরে জোরে কেশেই ফেললো। ওদের কারুরই বোধহয় খেয়াল নেই যে সামনের রো থেকে

সিনিয়ররা সবই শুনতে পাচ্ছেন – বা হয়তো সে ভাবনাটাই ওদের মধ্যে অনুপস্থিত! যা হোক মূল বিষয়ে ফেরা যাক।

অফিস থেকে বেরোচ্ছি, সামনের ফুটপাথের ফল-ওয়ালা জাকির হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললো, "বাবু, আজ খুব ভাল ভাল 'মাল' পেয়েছি, একবার দেখেতো যান।" অগত্যা, চললাম জাকিরের সঙ্গে, তার প্যাকিং বক্সের গাদায়। সত্যি সত্যিই পাকা আমের গন্ধে প্রাণটা কেমন যেন আমোদ করে উঠলো। এক বাক্স আম বগলদাবা করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম হাওড়া স্টেশনের দিকে। রোজ হাওড়া ব্রীজটা আমি হেঁটেই পার হই, আজও তার ব্যতিক্রম নেই। পিচবোর্ডের বাক্সটা বগলে থাকায় ডান হাতটা বাইরের দিকে বেশ একটু বেশিই ফুলে আছে, অর্থাৎ আমি একা দুজনের জায়গা নিয়ে হাঁটছি।

ব্রীজের মাঝামাঝি পৌঁছে দেখি ভীড়টা যেন একটু বেশি। বেশ কিছু লোক গোল করে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। যাতা-য়াতের জায়গাটা তাই ভীষণ ছোট হয়ে গেছে। ওদিক থেকে একতারায় সুর বাঁধার আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম, কোন বাউল-বাবাজি আসর পেতে বসেছেন। হাতে আমের বাক্সটা থাকায়, ধাক্কা খেতে খেতে আমি একটু কোণঠাঁসা হয়ে পড়েছি, কিছুতেই আর ঐ সরু জায়গাটা দিয়ে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যেতে পারছি

না। এমন সময় বাবাজি উচ্চকণ্ঠে গান ধরলেন, “গোলে ‘মাল’-এ গোলে ‘মাল’-এ পিরিত কোরনা...” হে ভগবান! আবার ‘মাল’!

কোনরকমে ভীড় ঠেলে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। দেখলাম চোদ্দ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আগের ট্রেনটা আমার জন্যে একটু বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছে। আজ শনিবার তাই ভীড় তেমন নেই। দ্বারীদের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে আমের বাক্সটা বাঙ্কের ওপর রেখে, একটু ফ্যানের হাওয়া নিচ্ছি। এর মধ্যে পাকা আমের গন্ধ কামরায় ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়ে গেছে। সিটে বসা যাত্রীরা সবাই একবার করে আড়চোখে বাঙ্কের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আম নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

ওঁদের কথাবার্তার দিকে খুব একটা মনযোগ না দিলেও, দুয়েকটা মন্তব্য তো কানে এসেই যাচ্ছিল। একজন হাহুতাশ করে বললেন, “আজকাল সেই আম আর কোথায়! সবই কার্বাইডে পাকানো...” সঙ্গে সঙ্গে পাশের জন বলে উঠলেন, “আরে দূর, ‘মাল’ ছাড়লে, কলকাতা শহরে আজও সবই পাওয়া যায়।” ওরে বাবা, কোথায় পালাই রে ভাই! ঐ আবার ‘মাল’!

রামরাজাতলায় নামতে হলে টিকিয়া পাড়ার পর থেকেই নিজেকে দাশ নগরের যাত্রীদের পিছনে সেট করে নিতে হয়। অগত্যা আমিও সেদিকেই মনঃসংযোগ করলাম।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আমার স্ত্রী কণা

আমাদের মেয়ে মামণিকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। বাংলা ভাষার সমার্থক শব্দের ব্যাপারে চর্চা চলছে। হঠাৎ শুনি, মামণি জিজ্ঞাসা করছে, “মা, দ্রব্য-এর সমার্থক শব্দ কি?” কণার জবাব, “এটা জানিস না! – ‘মাল’।” আমের বাক্সটা আমার হাত থেকে ধপ করে সশব্দে মাটিতে পড়ে যেতে, মামণি ওটা তুলে নিয়ে গেলো। কণা বললো, “কি গো, তোমার শরীর ঠিক আছে তো?”

বাংলা শব্দভাণ্ডারের এই ইচ্ছাকৃত ভাবে সৃষ্ট ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের কালে, কোন মাতৃভাষা-প্রেমীর হৃদয় কি স্থিরভাবে একটি আরবি শব্দের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমানতাকে মানতে পারে? আবার যার আক্ষরিক অর্থ হয় ‘ক্রয় বিক্রয়ের দ্রব্য’?

ইশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই জন্য যে রাতে অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর কম্পিউটারে খুঁজে পেলাম যে – বাঙালি নারীদের যে হিসাবে ‘মাল’ বলা হয় তার উৎস কিন্তু একটি সুন্দর ইংরাজী শব্দ সমষ্টির সংক্ষিপ্ত রূপ – অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে ‘মাল’ মানে ‘মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ লেডি’ (MAL)।

তবে অ্যালকেমিস্ট বা অপরাসায়নবিদরা এক সময়ে যে ভাবে প্যানেসিয়া বা সর্বরোগনিবারক ঔষধ দিতেন, এই ‘মাল’ শব্দটির সেইরূপ সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ আমি মানতে পারছি না, কারণ বাংলার নিজস্ব অনেক শব্দ রয়েছে, তাদের ফেলে দিয়ে – অনেকটা সর্বনামের মতো ‘মাল’ শব্দটির প্রয়োগের পিছনে কোন যুক্তি আমি দেখি না। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

মাতাল ও সেকাল

অমিত নাগ

বাড়ির একমাত্র ট্রেডমিল খারাপ হয়ে গেছে। এমনিতে কেউ শরীর চর্চা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। মাঝে মাঝে রিচ আইসক্রিম, ব্রেডপুডিং বা চকোলেট কেক খেয়ে প্যাকেটের গায়ে লেখা ক্যালোরি-পার-সারভিং দেখে আঁতকে উঠে দিন কয়েক প্রতিটি খাবারের ক্যালোরি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে হিসেবে করে চলে, ট্রেডমিলে হেঁটে, ছুটে – হাঁফিয়ে উঠে ক'দিন পরে আবার যে কে সেই। ঘুরেও তাকানো পর্যন্ত নেই বেসমেন্টের এক কোণে পড়ে থাকা ট্রেডমিলটার দিকে। অথচ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ কথা আমাদের সকলেরই জানা যে – কোনো জিনিস অচল হয়ে পড়া মাত্র জিনিসটার দরকার পড়ে সব থেকে বেশি। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

মিস্ত্রি ডাকা যেমন সময় সাপেক্ষ তেমন ব্যয় সাপেক্ষ। তা ছাড়া হয়তো দেখবো সে ঢাকনা খুলে একটা ছোট্ট সুইচ রিসেট করেই বিরাট অঙ্কের ফী চার্জ করে বসেছে। তার চেয়ে নিজেই ঢাকনা খুলে

দেখি না কেন গন্ডগোলটা ধরতে পারি কি না। গড়বড়টা হলো জিনিসটার ঢাকনা খুলতে গিয়ে। বাড়িতে থাকা সাধারণ হেক্সাগোনাল বোল্ট খোলার স্প্যানার নিয়ে গিয়ে আবিষ্কার করা গেলো ঢাকনাটা এক বিশেষ ধরণের বোল্ট দিয়ে আটকানো। যে কেউ সহজে যাতে সেটা খুলে ফেলে জিনিসটা খারাপ না করে ফেলতে পারে, তার জন্য মজবুত ব্যবস্থা। এই ছোট ছোট গর্তওয়ালা বিশেষ বোল্ট হেডের জন্য উপযুক্ত স্প্যানার আমার কাছে নেই। এক রাশ উৎসাহ নিয়ে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' গোছের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে কাজে নেমেছিলাম। এখন আফসোস করে বলতে হচ্ছে, ঠিকমতো একটা স্প্যানার পেলে আজ জিনিসিটাকে খুলেই ছাড়তাম। কথাটা বলে নিজেই চমকে উঠলাম।

আরেকজনও বলেছিলো অবিকল এমনি এক কথা, বহুকাল আগে। সে এক বিখ্যাত মাতাল।

তখন এ যুগের মতো গোটা জাতটাই মাতাল হয়ে ওঠেনি। কলকাতার ঘরে ঘরে বা বাঙালিদের মধ্যে চল ছিলো না সর্বস্তরে সামান্য ছুতোয় আবালবৃদ্ধবণিতার সুরা-পানাভ্যাসে। পানাসক্তিকে নীচু নজরে দেখা হতো মধ্যবিত্ত সমাজে। আমার এক আত্মীয়তো আবার সর্বসমক্ষে বস্তুটির নাম নিতেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ

করতেন না। অক্ষরযুগল একটু বদলিয়ে তিনি নাম দিয়েছিলেন দম। বেশ মজা করে বলতেন – অমুককে দেখলাম আজ দম খেয়ে এসেছে। তবে সবাই না খেলেও, সমাজের দুই স্তরে জিনিসটার সদ্ব্যবহারের প্রচলন ছিল – অতি উচ্চস্তরে আর নিম্নস্তরে। বড়লোকদের প্রকাশ্যে মাতলামির জন্য অনেক সামাজিক মূল্য দিতে হতো বলে রেখে-ঢেকে প্রাইভেট পার্টিতে বা ক্লাবে ফুর্তিফার্তা করতে হতো। গরিব মানুষের সে সব দায়ভার ছিল না। তাই প্রতি পাড়ায় দেখা পাওয়া যেত দুয়েক জন নাম করা মাতালের। রাস্তাঘাটে তাদের সঙ্গে হামেশাই মোলাকাত হবার সুবাদে, তারা আমাদের জীবনের এক রকম অঙ্গই হয়ে যেত বলা যায়। গরিবদের মধ্যে মদ খেয়ে মাতাল হতো কেউ কেউ অর্থাভাব, খাদ্যাভাব আর সাংসারিক দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকতে। কেউ কেউ আবার পেশার খাতিরে। কষ্টকর পরিবেশের কাজে বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের কাজে শরীরের কষ্ট লাঘব করতে এ পথ ধরতো কেউ কেউ। তারপর একদিন তারা পাড়ার, গঞ্জের, মফঃস্বল শহর বা শহর-তলীর মার্কামারা মাতাল নামে পরিচিত হয়ে উঠতো। জগা, ভজা, রতন, ভবা, ক্ষ্যাপা, জন এসব কত নাম সে সব মাতালদের।

মফঃস্বলের আর কলকাতার শহরতলীর মাতাল – এই দুই ধরণের মাতাল জাতে মাতাল হলেও গোত্রে আলাদা। জগা আর ভজা দূর মফঃস্বল ছোট শহরের শ্মশানের ডোম। লালমাটির দেশ। ছোটো জেলা শহরটির পাকা রাস্তা পেরিয়ে মোরামের লাল ধুলো ওড়া রাস্তায় মাইল-খানেক যাবার পর শীর্ণ নদীর পাড়ে, অশ্বত্থ গাছের পাশে শ্মশান কালী মন্দির ঘেঁষে থাকা শহরের এক মাত্র শ্মশানের ডোম ওরা। মড়া পোড়ানো সোজা কাজ নয়। দিবারাত্রি আগুনের তাপে দেহের ঘাম ঝরানো কাজে, শারীরিক কষ্ট ছাড়াও মনের ওপর চাপ পড়ে। মানুষ যতই বলুক এ কাজে ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে, জলে ডোবা কিশোরীর বা বিষ খেয়ে মরা মাথায় সিঁদুর ল্যাপা কোনো কচি বৌয়ের লাস পোড়াতে গিয়ে ওদের দুকখু হয় বৈ কি... তাই সে সব ভুলতে রাত-বিরেতে বাড়ি ফেরার সময় একটু আধটু নেশা করার প্রয়োজন পড়ে। নেশা করে ফেরে মাটির দিকে মাথা নীচু করে পা ঘষটে ঘষটে চলতে চলতে। বিড় বিড় করে কি যেন বলে আপন মনে। হাতে ধরা থাকে এদেশের তৈরী বিশেষ ধরণের চৌকো কেরোসিনের লণ্ঠন। লণ্ঠনের টিমটিমে হলদেটে আলোয় ওদের হাঁটুর

ওপরে ওঠা ধুতির তলার অংশ, কালো কালো দুটি টালমাটাল পা আর ধুলোময় নিচের রাস্তা ছাড়া ওদের চোখমুখ দেখা যায় না স্পষ্ট করে।

তখন অনেক রাত। বাড়ির কচি ছেলেরা ঘুম থেকে জেগে উঠে বসতে চাইলে জোর করে শুইয়ে হাত দিয়ে পিঠ থাবড়াতে থাবড়াতে মায়েরা ভয় দেখায়, ওই দেখ জগা, ভজা যাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়, নয়তো ধরে নিয়ে যাবে।

ক্ষ্যাপা জাতে হাড়ি বা বাগদি। পেশার ঠিক নেই। কখনো চামারদের পাড়ায় মরা গরু ছাগলের চামড়া ছাড়ানোর কাজ পেয়ে যায়। কখনো গেরস্থ ঘরের মেথর মুদ্দোফরাস হয়ে পায়খানা পাতকুয়াতলার শেওলা ঘষে মেজে পরিষ্কার করে দুই পয়সা আয়। অন্য সময় নিজেদের পালিত শুয়োরগুলোর দেখভাল করতে করতে সময় কেটে যায় বেশ। তবে পেশার ঠিক না থাকলেও নেশা একটু করতেই হয় রোজ সন্ধ্যে হলে। স্টেশনের পাশের গুমটির ঠেকে ঝাল ঝাল আলুরদম ঘুগনীর টাকনা দিয়ে দিশী পচাই খেয়ে বাড়ি ফেরে। তখনো তার হাসিমুখ দিনের বেলা দেখা হাসি মুখের মতোই। দিনের বেলার সরল সহজ হাসি মুখের মানুষটা সন্ধ্যে হলেই কেন যে নেশা করে ফেরে বোঝা যায় না। ক্ষ্যাপার হাসি মুখ ছাড়া অন্য মুখ দেখেনি কখনো

কেউ। মাতাল ক্ষ্যাপাকে তাই ভয় পায় না কেউ। এতো আনন্দে সে থাকে কি করে – তা ভেবে লোকে অবাক হয়। সন্ধ্যেবেলা যখন সে স্টেশন ধার থেকে বাড়ি ফেরে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে, তখন শুধু একটাই তফাৎ ধরা পড়ে মানুষের চোখে। তখন তার হাতে থাকে একটা পাঁচ সেলের টর্চ। মাতালদের সঙ্গে আলোর একটা সম্পর্ক কেন যেন দেখা যায় সব সময়। লণ্ঠন, হারিকেন বা টর্চ ছাড়া তারা বাড়ি ফেরেনা সন্ধ্যেবেলায়। তা অন্ধকারে কিসের ভয় জানা হয় নি কখনো। রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ভয় না অন্য কিছুর ভয়! কে জানে... দুই মাতালের টর্চ নিয়ে গল্পটাতো প্রায় সবারই জানা। সেই যেটাতে এক মাতাল আকাশের দিকে টর্চের আলো ফেলে অন্য মাতালকে বলছে, তুই ওই আলোটা বেয়ে আকাশে উঠে যেতে পারবি? অন্য মাতাল অমনি উত্তর দিচ্ছে, পাগল নাকি, আমি উঠি আর তুই আলোটা নিভিয়ে দিস আর আমি দুম করে পড়ে যাই আর কি...

মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণ বা মাঝবয়সী পুরুষদের মধ্যে নস্যি বা পানের নেশা থাকলেও, বোতল-জাত তরলের নেশা দেখা যেত না তেমন। অফিসের অনুষ্ঠানে বা বড় সাহেবের

পার্টিতে অফার করা হলে অনেকেই জিভ কেটে বলতেন – আমার ওটা চলে না মশাই। তাঁদের গিন্নীরা সগর্বে বলে বেড়াতেন আমার ওনার কোনো বদভ্যাস নেই। সেই সব পুরুষদের অভিজ্ঞতা – কালেভদ্রে প্রবল সর্দিজ্বরে ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা ব্র্যান্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

কোনো কোনো বড়দের গল্পের আসরে নীচুস্বরে সেই বিরল অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর স্মৃতিকথা চারণের ছবি মনে ভাসে আজও। তবে সাধনা ঔষধালয় জাতীয় আয়ুর্বেদীয় দোকানের দরজায় আঁকা হাতের গুলি পাকানো পেশীবহুল লেংটি পরা পুরুষের নীচে মহাদ্রাক্ষারিষ্ট মৃতসঞ্জীবনী সুধার বিজ্ঞাপন-ওয়ালা দোকান ঘরগুলোতে কিছু রসিক বৃদ্ধ মানুষের সন্ধ্যাকালীন জমায়েত চোখে পড়তো। টিমটিমে আলো আরো অনেক উঁচু সিলিং থেকে লম্বা রডে ঝোলানো পাখার নীচে, ছাদ অবধি উঁচু শিশি বোতল ভরা দেওয়াল আলমারি ভর্তি পুরোনো তেলচিটে ঘর-গুলোতে বসে তারা কিসের রসাস্বাদ গ্রহণ করতেন – তা আজও অজানা রয়ে গেছে।

এবার আজকের কাহিনীর শেষ মাতালটির কথায় আসা যাক, যার কথা মনে করেই এই কাহিনী শুরু হয়েছিল। আমাদের ছোট-বেলায়, কলকাতার এক

শহরতলীর পাড়ায় ছিল তার বাস। এংলো ইন্ডিয়ান বা হয়তো জাতপাতের হিসেবে আর একটু নিচের স্তরের। লালমুখো সাহেবের আদিবাসী সঙ্গিনীর ভালো-বাসায় সৃষ্ট জন এক্কার পূর্ব পুরুষ। সৃষ্টি কাহিনী যাই হোক, তখনকার অন্য অনেক এংলো ইন্ডিয়ানদের মতো জন হাফ সাহেব। রেলের স্টিম ইঞ্জিনের ড্রাইভার। সাঁতরাগাছি রেলের ইয়ার্ড থেকে স্টিম ইঞ্জিন চালিয়ে মালগাড়ি নিয়ে চার পাঁচ দিনের জন্য বেরিয়ে পড়ে জন দূর-দূরান্তরে। ওর বৌয়ের ভাষায় যাকে বলে লাইনে বেরোনো। লাইনে বেরোনোর সময় এক হাতে থাকে এলুমিনিয়ামের তিন চার থাকের টিফিন বাক্স, অন্য হাতে টর্চ। গায়ে রেল কোম্পানির দেওয়া সাস্পেনডার লাগানো প্যান্ট, যার সামনেটায় উঁচু কাপড়ে তৈরী এপ্রোনের মতো ডিজাইন। তখন সে সদ্য বাড়ি থেকে খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছে, ভদ্র সভ্য সোবার মানুষ। চার পাঁচ দিন পর ফেরার দৃশ্যটাও পাড়ার লোকের অতি পরিচিত। এপ্রোনের মতো সাস্পেনডার লাগানো প্যান্টে তখন কালিঝুলির দাগ। স্টিম ইঞ্জিনের বয়লারে বেলচা দিয়ে কয়লা ভরতে হয়। ভালভ আর অন্যান্য পার্টস-এর গ্রিজও লেগে থাকে গায়ে। ইঞ্জিনের বয়লারের আগুনে পুড়ে তার তামাটে হয়ে

যাওয়া চোখ মুখের চামড়া আরো ঝলসানো দেখায় গালের উঁচু অংশে, নাকের ডগায়, দুই ভুরুর মাঝখানে। নেশাগ্রস্ত জন কোনো দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে মুখ নীচু করে অল্প টলতে টলতে ঘরের দিকে ফিরতে থাকে। পাড়ার কেউ অভিযোগ করে না। এ সবে অভ্যস্ত সবাই। তবু জনের বৌ গজ গজ করতে থাকে। এর তার বাড়িতে রান্না বা ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজ করে থাকে সে, ছেলেটার পড়ার খরচ জোগাড় করতে। জনের রোজগার ভালোই, তবে নেশাভাঙ্গে মাইনের বেশির ভাগই খরচ করে ফেলে সে। তখন বৌ ছেলের কথা মনে থাকে না তার। আমরা জনের বৌয়ের গজগজানির কারণ বুঝতে পারি না। জন কখনো বকে না বা ভয় দেখায় না আমাদের। উল্টে মাতাল জনের পেছনে আমারই লাগি বেশি। কে যেন কবে শিখিয়ে ছিল – জন যখন লাইন থেকে মাতাল হয়ে ফিরবে, জিজ্ঞাসা করবি সেই ঠিক সাইজের পানাটা পেলে কি করবে ও। জন স্প্যানারকে পানা বলে। আমাদের প্রশ্নে আফসোসের সুরে জন বলে, ঠিক সাইজের পানাটা পেলে ও হাওড়া ব্রিজের প্রতিটা নাট বোল্ট খুলে ব্রিজটাকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলে আবার ঠিক

মতো জোড়া দিয়ে দিতে পারতো। আমরা হাসতে থাকি। অমন কাজ করে কার কি লাভ কে জানে!

জন এক হাতে টিফিন বাক্স অন্য হাতে টর্চ নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসে। আমরা ক্ষিপ্র শেয়ালের গতিতে দৌড়ে পালিয়ে যাই। আমাদের ধরতে না পেরে গজগজ করতে করতে মাথা নীচু করে বাড়ির দিকে ফিরে চলে জন।

আজ খারাপ হয়ে যাওয়া ট্রেডমিল খুলতে না পেরে সে সব কথা মনে পড়ে যায় আবার। এ কথা তো ঠিকই যে – জীবনে অনেকবার আমাদের অনে- কেরই কোনো না কোনো বিশেষ মুহূর্তে সঠিক ডিগ্রী বা দক্ষতা বা চেনাশোনা বা সুপারিশ বা অর্থসামর্থের অভাবে কোনো না কোনো বিশেষ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখে – জনের মতো আমাদেরও কারো কারো মনে তো হয়েছেই, ইশ যদি ঠিক সাইজের একটা স্প্যানার থাকতো হাতের কাছে! ■

নদীর নাম তুঙ্গভদ্রা

প্রথম অধ্যায়

ডঃ মালা মুখার্জী

সামনে তরঙ্গায়িত অতুল জলরাশি, দিগন্তে অস্তাচল -গামী সূর্য যার রক্তিম আভায় তুঙ্গভদ্রার জল গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করেছে, নদী থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসছে, জুনের অসহ্য উষ্ণতাযুক্ত গ্রীষ্মকেও যা মনোরম করে তুলছে। সুউচ্চ মাল্টিপার্পস ড্যাম থেকে জলপ্রপাতের ন্যায় বিপুল জলরাশি গর্জন করে মূল নদীতে পতিত হয়ে সৃষ্টি করছে তরঙ্গমালা। এই নদীবক্ষেই কী একদিন ভেসেছিল কলিঙ্গ-রাজকন্যা বিদ্যুৎমালা আর মণি-কঙ্কনার ময়ূরপঙ্খী নৌকা? হয়তো তা লেখকের কল্পনা, কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের তুঙ্গভদ্রার তীরে পড়ে এমন একজনও পাঠিকা ছিলো না যে কিনা মনে মনে নিজেকে বিদ্যুৎমালা বা মণিকঙ্কনা ভাবেনি। তাই তুঙ্গভদ্রার তীরে আসার ইচ্ছেটাও ছিল বহুদিনের, কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মেলবন্ধন হচ্ছিলো কই? বহুবার প্রোজেক্টের কাজে বেঙ্গালুরু যাই, দুইবার মাইসোরও গেছি, কিন্তু তুঙ্গভদ্রাকে

ছোঁয়ার সাহস হচ্ছিলো না। বেঙ্গালুরু থেকে ওভারনাইট জার্নি, সব ট্রেন ভর্তি থাকে, তার ওপর হাম্পিতে কোনো স্টেশন নেই, নামতে হয় হসপেটে, একদম বুঝি না কন্নড় বা তেলেগু ভাষা। তাহলে কী তুঙ্গভদ্রা অধরাই থেকে যাবে? কোনোদিনই কী প্রণাম করতে পারবো না পম্পাপতিকে? হয়তো তিনিই শুনেছিলেন আমার মনের ইচ্ছে, না হলে আমিই বা কেন এত বড় প্রোজেক্ট পাবো?

গত ১০ই জুনে যখন দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসেছিলাম, তখনও জানতাম যে ১৪ই জুন ফিরছি, কিন্তু প্লেনে ওঠার আগে জানলাম ১৮-১৯শে জুন আরও মিনিস্ট্রি লেভেলের মিটিং আছে। তাই আমার টিকিট
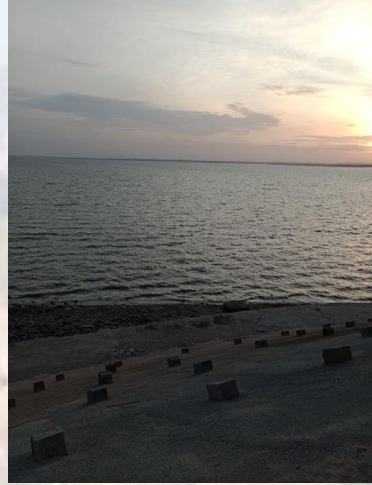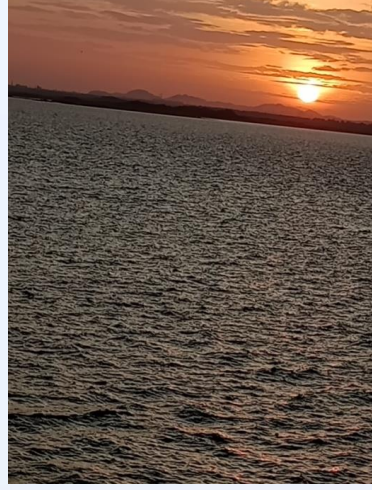
তরঙ্গায়িত তুঙ্গভদ্রার বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য...

বিশে জুনের। আমার আপত্তি হওয়ার কথা নয়, কারণ পুরো লজিস্টিকস হোস্টদের দায়িত্ব, কিন্তু

দুটো মিটিংয়ের মাঝে চারদিনের গ্যাপ। কী করবো ভাবছিলাম, বেঙ্গালুরু আর মাইসোর একাধিকবার গেছি, তবে কী কূর্গ বা ম্যাঙ্গালোর যাবো?

হোটেলের ট্রাভেল ডেস্কে যোগাযোগ করলাম, আমার হাতে ওরা কণ্ডাক্টেড ট্যুরের লিস্ট ধরিয়ে দিলো। আমি দেখছি, কোথায় যাওয়া যায়, চোখ আটকে গেলো দুটো ট্যুরে। প্রথমটা, বাদামী আর হাম্পির ট্যুর, শুরু হবে বৃহস্পতিবার থেকে, কিন্তু আমাকে শুক্রবারও অন-লাইন মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে হবে। অগত্যা দ্বিতীয় ট্যুরটা নিলাম, মন্ত্রালয়া-হাম্পি ট্যুর, শুক্রবার রাত থেকে যাত্রা শুরু, শণি-রবি পুরো ঘোরা, সোমবার রিটার্ণ জার্ণি। এসি ডিল্যাক্স ভলভোতে যাওয়া আসা, তবে স্লিপার কোচ নয়, রিক্লাইনিং সীট। এটি কর্ণাটক ট্যুরিজমের ট্যুর তাই যশবন্তপুর বিএমটিসির বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়ী ধরতে হবে। আমি ছিলাম গলফ কোর্সের কাছে 'কুমার কৃপা গেস্টহাউজে', সেখান থেকে বাসস্ট্যাণ্ড মাত্র চার কিলোমিটার, কিন্তু বেঙ্গালুরুর ট্রাফিক জ্যাম হলো ভয়ানক।

সেদিন আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও পড়ছে। অটো নিলাম ক্যাবে, এক ঘন্টা লাগলো পৌঁছাতে, যথারীতি জ্যাম ছিলো। আধো অন্ধকার বহুতল বাসস্ট্যাণ্ড, আমাদের বাস কোথায় আসবে কে জানে? গ্রাউণ্ড ফ্লোরে কর্ণাটক ট্যুরিজিমের অফিস, খোঁজ নিয়ে জানলাম ফার্ষ্ট

ফ্লোরে বাস আসবে।

আমি নির্দিষ্ট স্থানে এলাম। আলাপ হলো কয়েকজন সহযাত্রীর সঙ্গে, তার মধ্যে জয়ালক্ষ্মী আর তার মা, মেয়েটি আইটি সেক্টরে কর্মরত, কন্নড় মেয়ে, কিন্তু আলাপী। আন্টি আবার নিজের ভাষা ছাড়া বোঝেন না। একে একে আরও মানুষজন এলেন, কেউ দম্পতি, কেউ মা-ছেলে, কেউ আবার দুই বান্ধবী। আমি কুড়ি বছর উত্তর ভারতে আছি, এদিকে যেমন মেয়েদের একক ভ্রমণ দেখা যায় না দক্ষিণে অমন নয়। বিএমটিসির স্ট্যাণ্ডে বহু মহিলা ড্রাইভার, কন্ট্রাক্টর, পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছেন। তাই আধো অন্ধকার বাসস্ট্যাণ্ড একটুও অস্বস্তিকর নয়।

বাস এলো, এলো বৃষ্টিও। বাস চলতে লাগলো, এসির বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছে। আমি কোনো চাদর আনিনি, শালও না। দিল্লীতে যখন দাবদাহ চলছে, থার্মো-মিটারের পারদ ছুঁয়েছে প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রী সেলসিয়স, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এখানে এরকম আবহাওয়া হবে। জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি, পাশের বউটি শাল মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। এখনও আলাপ হয়নি। যাই হোক, বাস বেঙ্গালুরু ছাড়ালো, ঠিক দুই ঘন্টাবাদে প্রথম হল্ট, নৈশভোজনের জন্য। পুরো-পুরি নিরামিষ ধাবা। আমি যেহেতু খেয়ে গিয়েছিলাম তাই স্যাণ্ডউইচ আর আইস-ক্রিম নিলাম। আধঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের ব্রেক,

আবার যাত্রা শুরু। রাত আড়াইটেতে সেকেণ্ড হল্ট, রিফ্রেশ হওয়ার জন্য, ফের পথচলা শুরু।

তন্দ্রা এসেছিল কখন জানি না, হাইওয়েতে লরির আনাগোনা আর টোল প্লাজা দেখতে দেখতে চোখটা বুজে এসেছিল, কিন্তু চটকা ভাঙলো সংস্কৃত মন্ত্রের শব্দে। আমরা এসে গেছি মন্ত্রালয়ে, একটা হোটেলে একটু ফ্রেশ হয়ে দর্শন, তারপর প্রাতঃরাশ খাওয়া, তারপর সাড়ে নটায় পুনরায় যাত্রা।

মন্ত্রালয় হলো অন্ধ্রপ্রদেশ আর কর্ণাটকের বর্ডার, রাঘবেন্দ্র তীর্থ নামে এক সন্ত এখানে জীবন্ত সমাধি নিয়েছিলেন, ভক্তদের বিশ্বাস আগামী পাঁচশো বছর তাঁর উর্জা এখানে বিরাজমান থাকবে। যাত্রাকালীন পোশাক পরিবর্তন করে সালোয়ার কামিজ পরে নিলাম। এখানে ট্রাডিশনাল পোশাকে দর্শনে যেতে হয়। সত্যম ডিলাক্স হোটেল থেকে সোজা হাঁটা পথ। সহযাত্রীরাও চলেছেন, অনেকে এখানকার দিক্ষিত শিষ্য-শিষ্যা। বিশাল মঠ, মন্দিরের মাথায় স্বর্ণকলস, তাতে প্রোথিত রয়েছে ওঁকার চিহ্নিত গৈরিক পতাকা। তার সাথে বাজছে বৈদিক মন্ত্র, 'ওঁ নমো রাঘবেন্দ্রায় নমঃ'।

অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে দর্শন হলো, এবার ব্রেক-ফাস্টের পালা। মন্দিরের রাস্তায় দুধারে দোকান, কিন্তু পরিষ্কার নয় একটুও। তবুও খেতে ঢুকলাম, একটা দোকানে একটা বউ বড় বড় ফুলকো লুচি ভাজছে, দৃশ্যটা লোভনীয়। মনে পড়লো সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়ের কাকাবাবু সিরিজের

'বিজয়নগরের হীরে' গল্পটি, জোজো-সন্তুরাও এমন লুচি-আলুরদম খেয়েছিলো। আমিও অনুপ্রাণিত হয়ে অর্ডার দিলাম, একটা লুচি কুড়ি টাকা। লুচি এলো, তার সাথে চাটনি, মানে আমাদের ভাষায় আলুর তরকারি, এখানে সবই চাটনি। মন ভেঙে গেল যখন লুচিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তরকারিতে মেখে দিলো। ভাগ্যিস একটা লুচি বলেছি। কোনোরকমে একটু মুখে দিতে মনে হলো আস্ত লঙ্কাবন খেয়েছি, নেহাত খেতে হবে তাই খেলাম।

কীসের তেল কে জানে! পেট ভরে উঠলো একটা লুচিতেই, এবার কোল্ডড্রিঙ্ক খেতে হবে। পথের দুধারের দোকানে চিরপরিচিত সফ্ট ড্রিঙ্কসের সাথে বিক্রি হচ্ছে লাল, নীল পানীয়, যার নাম 'গোলি সোডা'। লোভনীয় বটে! একটা কুড়ি টাকার বোতল নিলাম, ঝাঁঝালো হাল্কা নীলাভ পানীয়, ব্লুবেরি ফ্লেভারের। এরই মধ্যে দেখা হলো আরও দুই সহযাত্রীর সঙ্গে, মা আর ছেলে, ভোপালের বাসিন্দা, ছেলে বেঙ্গালুরুতে চাকরি করে। তাঁরাও হন্যে হয়ে মনোমত ব্রেকফাস্ট খুঁজছেন, কিছুই পাচ্ছেন না, মিষ্টির দোকান একদম নেই, এরই মধ্যে দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে নটায় পৌঁছল। আবার বাসে ওঠো, এবার গন্তব্য পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির, গুহার মধ্যে হনুমানজীর প্রস্তর খোদিত মূর্তি। এখানে হনুমানজী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, রাঘবেন্দ্র তীর্থ। এই ফাঁকে বলে দিই, আমাদের এই ভ্রমণ কিন্তু

প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যার ভূমিতে হচ্ছে। এই ভূমি শুধু সুলতানি যুগে একমাত্র হিন্দু সাম্রাজ্যেরই জন্ম দেয়নি, রামায়ণের বানর বীররাও এই মাটির সন্তান। বিজয়নগর তাই বহুকাল থেকেই বীর প্রসবিনী।

আজ শনিবার, পান-সুপারি দিয়ে পুজো দিতে হয় হনুমানজীর। কথিত আছে এই গুহার মধ্যে রাম লক্ষ্মণকে বন্দী করে রেখেছিল অহীরাবণ আর মহীরাবণ। পঞ্চমুখী হনুমান স্বরূপ তখনই প্রকটিত হয়েছিল, এই স্বরূপ হনুমানজীর সাক্ষাৎ মহাদেব হওয়ার প্রমাণ। শনি আর মঙ্গলবারে ভীড় এমনিতেই হয় হনুমান মন্দিরে। পাথুরে সিঁড়িতে লাইন দিয়ে ঘন্টাখানেক কসরতের পর দর্শন হলো। কয়েকটি পট নিলাম সহকর্মীদের জন্য, দিল্লীর লোকজন খুব হনুমান ভক্ত হন।

এরপর গাড়ী চললো হসপেটের দিকে, পথে পড়লো রায়চূড় দুর্গ, এই দুর্গ থেকেই বাহমনী সুলতান বিজয়নগরে প্রতি বৎসর হামলা করতেন। এই দুর্গের সামনের বিশাল যানজটে, বাস অনেক সময় ব্যয় করতে বাধ্য হলো। পরশু বকরিদ, তাই মাংসের বাজার বসেছে, জমিয়ে চলছে ঈদের কেনাকাটা। দোকানে দোকানে টাটকা ফল, খেজুর, জামাকাপড়, নধর পাঁঠা, ব্রয়লার মুরগী ইত্যাদি। দুর্গের প্রাচীর পার হতেই বাস ছুটলো, গন্তব্য তুঙ্গভদ্রা ড্যামের গেষ্টহাউজ, তবে

পথে অল্প সময়ের লাঞ্চ ব্রেক। মনে আছে কাকাবাবু সিরিজের বিজয়নগরের হীরে গল্পটি? তুঙ্গভদ্রা ড্যামের খুব কাছে যে গভর্মেন্ট গেস্টহাউজ ছিলো সেটিই এখন কর্ণাটক ট্যুরিজমের হোটেল। ছোটো দোতলা স্ট্রাকচার, অনেকটা বাগান, দামী কাঠের দরজা জানলা, সবকিছু প্রাচীনত্বকে নির্দেশ করে।

এই হোটেল থেকে তুঙ্গ-ভদ্রা ড্যাম হাঁটা পথ, আমরা কোনো রকমে লাগেজ রেখেই ছুটলাম, রায়চূড়ে এতটা সময় গেছে যে ফ্রেশ হওয়ার সময় নেই। তবে ছিমছাম সাজানো-গোছানো এসি ঘর, সাদা টাওয়েল আর মাইসোর স্যান্ডেল সোপ দেখে স্নান করে ঘুমোতে মন চাইছিলো,
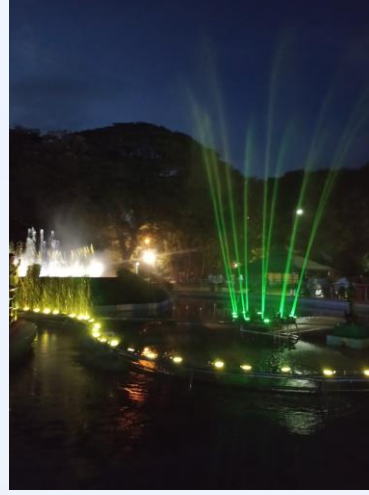
মিউজিকাল ডান্সিং ফাউন্টেন...

কিন্তু এখনই না গেলে তুঙ্গ-ভদ্রায় সূর্যাস্ত মিস করবো।

হোটেলের গেট পার হয়ে বড় রাস্তা, তার ওপারে ড্যামের গেট। প্রবেশে টিকিট আছে, তবে সানসেট পয়েন্টে যেতে বেশ হাঁটতে হয়। সাজানো গোছানো পাহাড়ি রাস্তা, বৃষ্টিস্নাত ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার। বিকেল ছটায় সূর্যের আলো হাল্কা সোনালী, আমরা পা

চালালাম, পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে সানসেট পয়েন্ট। নীচে তরঙ্গায়িত স্রোতস্বিনী তুঙ্গভদ্রা, ডানপার্শ্বে ড্যামের জল উঁচু থেকে পড়ছে, জলের রঙ গেরুয়া হয়ে আসছে। ক্রমশ সূর্যদেব গাঢ় লাল হয়ে নদীর জলে ডুবতে লাগলেন। এমনই এক মনোময় সন্ধ্যায় বোধহয় কলিঙ্গ রাজকুমারীরা ময়ূর-পঙ্খী ভাসিয়েছিলেন।

সূর্য পাটে বসতেই মিউজিকাল ফাউন্টেন শুরু হয়ে যায়, তাই লোকজন দৌড়তে থাকে। যারা মাই-সোরের বৃন্দাবন গার্ডেন গেছেন তাঁরা বিষয়টি আন্দাজ করতে পারবেন। সন্ধ্যা যত গড়ায় রঙিন ঝর্ণা তত লাল, নীল, গোলাপি, সাদা রঙে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। ছোটো ছোটো ফাউন্টেন পার হয়ে মিউজিক্যাল ফাউন্টেন সবার গন্তব্য, মোহময়ীরূপ ধরে নাচতে নাচতে ফাউন্টেন গাইছে, ‘আ যা পাণি, পাণি, পাণি, পাণি...”

তখনই মনে হচ্ছিলো চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

ড্যামের সামনের লেক...

আমাদের হোটেল, তুঙ্গভদ্রা ড্যামের কাছে...

হোটেলে ফিরে পেটপুজো সেরেই ঘুম, কাল বিজয়-নগর অভিযান, একদম ঠিক সকাল আটটায়। ...ক্রমশ ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২২

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tath

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zkwb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lnps

https://online.fliphtml5.com/osgiu/gqaz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/noyb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/oomz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eoat/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ubpb/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/rvpr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/fbyc/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'-এর ২০২২ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

মুক্তি

প্রথম পর্ব

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

বলটা উঁচু পাঁচিল টপকে ভিতরের বাগানের মধ্যে পড়লো। সন্তু বললো, যা খেলা শেষ, আর বল পাওয়া যাবে না।

কিংশুক জিজ্ঞাসা করলো, খেলা শেষ কেন, আর বলটাই বা পাওয়া যাবে না কেন? পাঁচিল টপকে বাগান থেকে বলটা কুড়িয়ে নিয়ে এলেইতো হয়।

সন্তুসহ বাকি ছেলেরা বললো, সে কি রে তুই কি কিছুই জানিস না! আর জানবিই বা কি করে! সবে মাত্র কিছুদিন হলো এই পাড়ায় এসেছিস আর আমাদের সঙ্গে দু-তিনদিন হলো খেলছিস।

কিংশুক বিস্ময়ে চোখ বড় করে তাকাতেই সবাই সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো, ঐ বাগানের মধ্যে একটা পাগল বাস করে, যদিও তার পা দুটি লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা কিন্তু শিকল সমেত দুটি পা দিয়ে সে ভালোভাবে হাঁটা রপ্ত করেছে। সেই পাগলটি ভীষণ হিংস্র, লোক দেখলেই সে কামড়ে-আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, আর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ

করে আওয়াজ করে। কোন কথা বলে না। বাগানের মধ্যে একটা ভাঙাচোরা ঘর আছে আর তার মধ্যে আছে একটি ভাঙাচোরা খাটিয়া আর কালো ও বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কয়েকটি কাঁথা ও জামা প্যান্ট। শুনেছি পিছনে যে বিরাট তিনতলা বাড়িটা আছে সেই বাড়িটা নাকি ওদের। বাড়ির এক চাকর সময়মতো খাবার দাবার দিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে সেই খাবার সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সে যখন খাবার দাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাঙচুর করতে শুরু করে আর মুখ দিয়ে বীভৎস গোঁ গোঁ আওয়াজ করে, তখন ঐ পাগলের কোন এক কাকা একটা চাবুক দিয়ে তাকে ভীষণভাবে পেটায় যতক্ষণ না সে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, আর তাছাড়া...

তাদের কথা শেষ হতে না হতে কিংশুক বলে উঠলো, ঠিক আছে আমি পাঁচিল টপকে বাগান থেকে বলটা এনে দিচ্ছি। সবাই রৈ রৈ করে বলে উঠলো, একদম যাবি না, গেলেই তোকে ও আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। খেলতে এসে তুই যদি কোন বিপদে পড়িস তাহলে তোর বাড়িতে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

কিংশুক বললো, তোদের কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না, বাবা মাকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেবো। শুধু একটা কথা – যতক্ষণ না আমি ফিরি ততক্ষণ তোরা অপেক্ষা কর।

কিংশুক যেখান দিয়ে পাঁচিলে ওঠা অপেক্ষাকৃত সোজা সেখান দিয়ে পাঁচিলে উঠতে লাগলো, আর সবাই দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলো।

উঁচু পাঁচিলের ওপরে উঠে কিংশুক একটু থতমত খেয়ে গেলো। নীচেটা ঘন আগাছায় ভর্ত্তি, চলন জায়গা এত-টুকুও নেই। একটা ভাঙা কুটির আছে বটে, কিন্তু কোন লোককে দেখা যাচ্ছে না। পাঁচিলের গা বেয়ে নামবার কোন উপায় নেই। লাফিয়ে নীচে পড়তে হবে। ওর পায়ে অবশ্য স্নীকার (কেটস) জুতো পড়া আছে।

কিংশুক বাগানে নামার জন্য ঝাঁপ দিলো। মরমর করে কিছু আগাছা ভেঙ্গে সে নীচেতে পড়লো। আগাছার কাঁটায় তার হাত সামান্য কেটেও গেলো। চারিদিকে বড় বড় গাছ, আর অসংখ্য গুল্ম লতায় জায়গাটা ভর্তি। তাছাড়া সাপ-খোপ, পোকা-মাকড় থাকার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাগানে নেমে, না ঠিক বাগান নয়, আগাছার জঙ্গলে কিংশুক খুব সন্তর্পনে পা ফেলে ফেলে চারিদিকে বল খুঁজতে লাগলো। মাঝে মধ্যে আম, কাঁঠাল, অশ্বথ, বট ও দেবদারু গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পড়ন্ত বিকালে অনেক পাখি গাছে তাদের আস্তানায় ফিরে এসেছে আর তাদের কলতানে জায়গাটা মুখরিত।

না, এসব দেখলে চলবে না, তাড়াতাড়ি করে বল খুঁজে নিয়ে তাকে ফিরে যেতে হবে। বেশ খানিকটা এগিয়ে

সেই ভগ্ন কুটিরের কাছাকাছি পৌঁছে, সে একটা নয়, দু-দুটি বল কুড়িয়ে পেল। এবার লক্ষ্যপূরণ হয়েছে ভেবে সে আনন্দিত হয়ে উঠলো। এইবার বন্ধুদের কাছে ফিরে তাদের চমক দেওয়া যাবে। বল দুটি হাতে নিয়ে তার চোখ হঠাৎ কুটিরের ভিতরে পড়লো। কিন্তু সে যা দেখলো তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেলো। সে আর এতটুকুও নড়তে পারলো না। ভিতরে কুৎসিত দর্শন সেই পাগলটা বসে আছে। চোখ দুটি তার ভাটির মতো লাল, গোটা মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি – আর তা গলা পর্যন্ত প্রলম্বিত। মাথার জটা ধরা চুল ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পরনে কালো বিবর্ণ হাফহাতা জামা আর পায়জামা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে কিংশুকের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিংশুক বল নিয়ে অনায়াসেই ছুটে পালিয়ে আসতে পারতো, অবশ্য পাঁচিলে উঠবার সময় সে হয়তো পেতনা, কারণ তার আগেই পাগলটা হয়তো ওকে ধরে ফেলতে পারতো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তার পা দুটি যেন মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে বসে গেছে। চেষ্টা করেও সে এক ইঞ্চি এগোতে পারছে না। আর ঠিক সেই সময় পাগলটা উঠে দাঁড়ালো। জ্বলজ্বলে চোখ আর বীভৎস মুখভঙ্গি করে গোঁ গোঁ আওয়াজ করে সে এগিয়ে এলো। ঠিক তখনই কিংশুক গলার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে বলে উঠলো, আমি তোমার

কোন ক্ষতি করতে আসিনি। শুধু বাগান থেকে বলটা কুড়োতে এসেছি। সেটা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাকে মারো কিন্তু একদম মেরে ফেলো না। তাহলে মা-বাবা ভীষণ কষ্ট ও শোক পাবে। আচ্ছা, আমি কি তোমার বন্ধু হতে পারি না? দেখো আমি তোমার খুব ভালো বন্ধু হবো। তোমার সব কথা আমি শুনবো, এই বলে কিংশুক ভয়ে চোখ বুঁজল। এক-দুই-তিন মিনিট নীরবতা, তারপর কিংশুকের কাঁধে কে যেন হাত রাখলো। চোখ খুলে সে দেখে সেই পাগলটার হাত তার কাঁধে, আর সে মিটমিট করে হাসছে। কিংশুকের ধরে প্রাণ এলো। উৎসাহিত হয়ে সে বললো, তুমি আমার বন্ধু হবে? পাগলটা ফিক করে হেসে কর্কশ গলায় বললো, তোর নাম কিরে, কোথায় থাকিস?

আমার নাম কিংশুক। আমরা এই পাড়ায় নতুন এসেছি, আর কয়েকদিন হলো এই মাঠে খেলতে আসছি।

এখন বাড়ি যা, মাঝেমধ্যে আসবি।

আসবো কি করে? বল না পড়লে তো আসতে পারবো না। তাহলে বন্ধুরা সন্দেহ করবে, পাড়ার সবাইকে, বাবা-মাকে জানিয়ে দেবে, তখন কিন্তু দুজনেই খুব মুশকিলে পড়ে যাবো।

পাগলটা ফিক করে হেসে বললো, যেদিন যেদিন তোর আসতে ইচ্ছা করবে সেদিন তুই খেলতে খেলতে শট মেরে বলটা বাগানের মধ্যে ফেলে দিবি, তাহলে আর

কেউ সন্দেহ করবে না।

কিংশুক মনে মনে ভাবলো – হুঁ, পাগলটার বুদ্ধি আছে বটে। তাহলে এ তো পাগল নয়।

যা যা এবার ফিরে যা। এই বলে পাগলটা একটা ছোট ভাঙা মই বাগানের কোনের দিকে লাগিয়ে দিয়ে বললো, এটা দিয়ে পাঁচিলে উঠে পড়। এটা এখানেই রাখা থাকবে। যখন আসবি, এই দিকটা দিয়ে উঠে নীচে নেমে পড়বি।

একরাশ ভালো লাগা নিয়ে কিংশুক জিজ্ঞাসা করলো, তোমার নাম কি বন্ধু?

সে সব পরে হবে'ক্ষণ, তুই এখন যা, কেউ দেখে ফেলবে।

কিংশুক বিরাট এক যুদ্ধ জয় করে বন্ধুদের কাছে ফিরে এলো। ...ক্রমশ ■
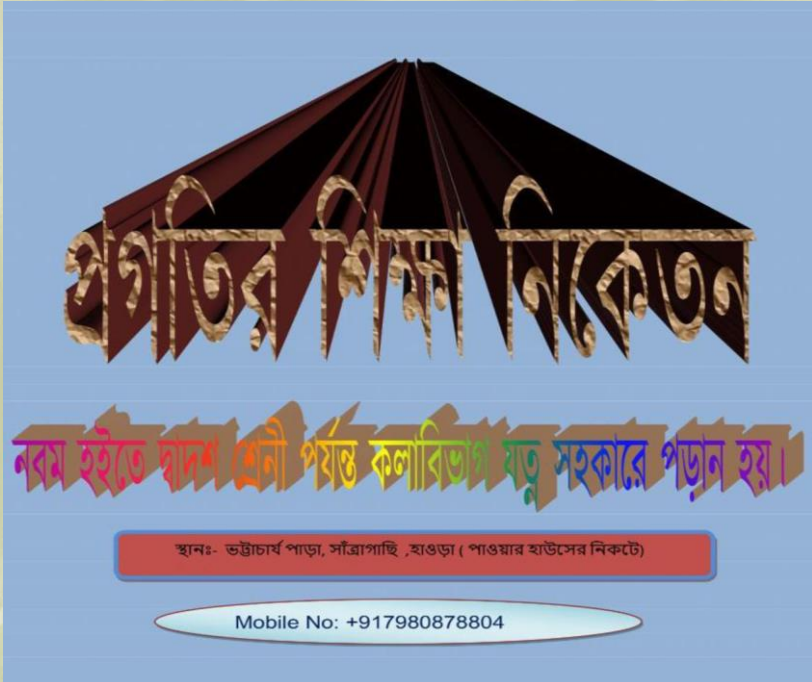
মাদুলির খোঁজে

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

এই নিয়ে প্রায় কয়েক হাজার শবদাহ করেছে মলয়, হিরু ডোমের একমাত্র ছেলে ও। পড়াশুনায় দুর্দান্ত ফলাফল করেও, ও একটা সুন্দর ক্যারিয়ার গঠন করতে ব্যর্থ হয়। শেষমেষ এই অত্যন্ত অপছন্দের কাজকেই পেশা হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হলো ও। আর এ ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না ওর, হিরুর অকাল মৃত্যুর পর, তার অভাবের সংসার চালাতে, মলয় এক রকম বাধ্য হলো পেশায় ডোম হতে। প্রথম প্রথম মলয়ের কাছে এ কাজ যতটা অপছন্দের ছিল, এখন ততটাই পছন্দের। কারণ মাসিক বেতনের পাশাপাশি ও পায় উপরি উপহার। শবের গায়ে যদি কোনো গহনা থাকে, তবে তা ওর উপরি পাওনা।

শ্মশানের অশ্বত্থ গাছ-টার নীচে বসে মনের সুখে মদ গিলছিল মলয়। তখন প্রায় মধ্যরাত বলা যায়। দূর থেকে ভেসে এলো "বলো হরি হরি বোল" ধ্বনি। নেশার ঘোরে মলয় ওর চেলা পাঁচুকে বলল, "ধুর শালা

মরারও আর সময় পায় না। দিন নেই রাত নেই মরার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। যত আপদ। একটু সুখ করে নেশাও করতে দেয় না। চল দেখি এই মরা সাথে করে কি এনেছে? আজকাল মানুষ-গুলো এত পিশাচ হয়ে গেছে যে মরার অঙ্গে একটাও গয়না রাখে না। দেখি আজ কি আছে এ পোড়া কপালে।” টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মলয়। স্বপরিবারে মরা তখন শ্মশানে। কেউ কাদঁছে, কেউ মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনা করছে, কেউ বা লোক দেখানো ‘আহা উহু’ করছে। মলয় তাদের কাছে যেতে সেই লোকগুলোর কিছু কথা ওর কানে এলো। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল, “এতো কম বয়সে এতো ঔদ্ধত্য দেখালে এমনই হয়। কত লোকের সর্বনাশ করেছে, তার পাপ কোথায় যাবে?” একজন বলল, “আরে রূপের বহর দিয়ে মন ভোলাত, পাড়ার কলঙ্ক। কোথায় দাদা বৌদির কথা মতো সব মেনে নিবি – তা নয়, অনাচার বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছিল, যার পরিণতি আজ এই। আর একজন একটু নম্রস্বরে বলল, “সে যাই হোক, ছোট থেকে দেখছি, যত অন্যায়ই করুক, তার পরিণতি এই যে সেটা মেনে নেওয়া যায় না।”

মলয় সব শুনে আরেকটু

কৌতূহলী হয়ে উঠল। ও ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে দেখল সাদা ফুলে ঢেকে আছে একটি মেয়ের শবদেহ। যুবতী শবের মুখটা যেন একটা অদ্ভুত মায়া ভরা, যা মলয়ের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করল। মনে মনে ও বলল, "আহা এই কচি বয়েসেই আত্মহত্যা। এর আগেও অনেক এই কেস দেখেছি, কিন্তু আজ যেন একটু বেশি মন খারাপ লাগছে। মনে হয় নেশাটা একটু বেশি হয়ে গেছে..."

তবে মলয় ক্ষণিকের জন্য আবেগে আপ্লুত হলেও ওর নজর ছিল শবের সাথে কোন গহনা আছে কিনা সেই দিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় – এই মৃত মেয়েটির অঙ্গে একটিও গহনা নেই। শবদাহের পর মলয় অস্থি নিতে গেলো। অস্থি নিতে নিতে মনে মনে ও বলল, "ধুর কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ, একটা সুতোও নেই। শালা মালের টাকাটাও উঠল না।"

আকাশে নতুন ভোরের ছোঁয়া লেগেছে। হাল্কা আলোয় হঠাৎই ওর মনে হলো একটু দূরে গাদা করে রাখা ফুলগুলোর পাশে কি যেন একটা জিনিস একটু চকচক করছে। একটু আশ্চর্য হয়ে ও ঐ জায়গাটাতে গিয়ে দেখতে পেল একটা মাদুলি পড়ে আছে – তবে তা সোনার নয়, তামার।

রাগে গজ গজ করতে করতে ও ওটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কি মনে হলো, ও মাদুলিটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে নিলো।

তারপর অস্থি ও ঘট মৃতের পরিবারকে দিয়ে, ও বাড়ির দিকে রওনা দিলো। ভোর প্রায় হয়ে এসেছে। সূর্যের আলো এক টুকরো মেঘের ফাঁকে হিরের আংটির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্মশানের গঙ্গার ঘাটের পাড় ধরে গেলে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথেই গঙ্গার ধারেই ওদের বাড়ি।

মলয়ের পরিবার বলতে ওর মা আর বোন। উচ্চ শিক্ষিত হয়েও ভাগ্যের হাতে সে আজ পরাস্ত। গরীবের এই সংসারে সেই এখন একমাত্র রোজগেরে পুরুষ। লাভের লাভ কিচ্ছু না হওয়ার জন্য ওর মেজাজ একবারে সপ্তমে। ঘরে ঢুকেই হোম্বি তোম্বি হয়ে ও মাকে বলল, "তাড়াতাড়ি যা খাবার আছে দে, গিলে আবার সৎকারের পুণ্যি অর্জন করতে যাই।"

মলয়ের মা শান্ত স্বরে বলল, "বাবা আজ পান্তা ছাড়া কিছুই নেই। আমি পেঁয়াজ কেটে দিচ্ছি খেয়ে নে। বাজার দর এতো আগুন যে কিছুই কিনতে পারিনি। তোর অসুস্থ বোনের চিকিৎসা করার খরচ মেটানোর পর হাতে কটাই বা টাকা থাকে বল? তার ওপর তোর এই নেশা করে করে সব

শেষ হয়ে গেলো। তোদের বাবা যখন ছিল এত অভাব ছিল না।”

মায়ের কথাটা ওর বুকে শূলের মতো বিঁধল। ওর রাগ মাথায় চড়ে গেলো, রাগে চোখ লাল হয়ে গেলো। মাকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ও বলল, “বেশ করি নেশা করি, কারোর বাপের পয়সায় করিনা। ধুস খাবোনা কিছু। তোরাই গান্ডে পিণ্ডে গেল। আমি চললাম।”

এই বলে কাঁধে গামছা নিয়ে, ও আবার শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলল। সারাদিনে আর ওর পেটে ভাত পড়ল না – পড়ল শুধু লাল জল। প্রবহমান গঙ্গার তীরে বসে, রাগে ক্ষোভে ও শুধু আকণ্ঠ মদ গিলতে লাগল। মলয়ের মনের কোণে যেমন মেঘ জমেছে, ঠিক তেমনি আকাশের কোলেও জমেছে কালো মেঘ। বৃষ্টি এখনি নামবে। পাঁচু বলল, “বস্ বৃষ্টি নামবে বাড়ি চলো।”

মলয় বিরক্ত হয়ে বলল, “আ... বিরক্ত করিসনা তুই যা ঘর। আমার কোনো ঘর নেই। ভাগ যা ইঁহা সে।” বলেই বোতল হাতে তুলে নিয়ে আবার মদ গিলতে লাগল ও। পাঁচু আর অপেক্ষা না করে বাড়ি ফিরে গেলো। বিদ্যুতের ঝলকানি আর মেঘের গুরু গর্জনের সাথে শুরু হলো ঝমঝম করে মুষলধারায় বৃষ্টি। বৃষ্টির সময় গঙ্গার রূপ একবারে আলাদা। সে যেন করাল রূপী। শো শো শব্দে

অনবরত হাওয়া বয়ে চলেছে। পুরো শ্মশান ভূমিতে ও এখন একে-বারে একা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নামল।

হঠাৎ ওর চোখে পড়ল অনতিদূরে কে যেন বৃষ্টির মধ্যে কাদা মাটি ঘেঁটে কি খুঁজছে। মলয় টলমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দিকে গেলো। ও দেখল একটা মেয়ে কাদায় হাত দিয়ে কি যেন খুঁজছে। মলয় নেশার স্বরে বলল, "এই মেয়ে এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে এখানে একা একা কি খুঁজছ? বাড়ি যাও। জায়গাটা ভালো নয়।"

মেয়েটি কোনো উত্তর দিলো না, আপন মনে সে কিছু খুঁজে চলেছে।

এবার মলয় বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলল, "কি হলো কথা কানে যাচ্ছে না? আরে কি খুঁজছ?"

মেয়েটি কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিলো, "না না আমি কোথাও যাব না। আমার জিনিস না পেলে আমি যাব না।"

"কি জিনিস?..."

"আমার একটা ভীষণ দরকারি জিনিস?"

"আরে সেটা কি?"

"আমার মাদুলি... কথা শেষ হতে না হতেই বিদ্যুতের ঝলকে মেয়েটির মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠল।"

এ কি! এতো সেই মেয়েটি! যার নিথর দেহটা আজ ভোরে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ কি দেখছি! আমার কি নেশা একটু বেশি হয়ে গেছে?

না না ওই মেয়েটি কিভাবে জীবিত হতে পারে?” মলয় চোখটা একটু রগড়ে নিয়ে আবার দেখল। কিন্তু সত্যি কোনো ভুল হচ্ছে না। এ তো সেই মেয়েটি। ভয়ে ওর প্রাণ কেঁপে উঠল। গলা দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছিল না। তবু ও কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “তুমি? তুমি কি করে...তোমার তো...”

“হ্যাঁ আমি মৃত। কিন্তু আমি মরেও মরিনি। আমার একটা মাদুলি ছিল। বলতে পারো ওটাই আমার শেষ ও একমাত্র সম্বল। তুমি কি দেখেছ আমার মাদুলিটা?”

মলয় মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, পোড়ানোর সময় তো দেখেছিলাম। তবে ভূতের আবার মাদুলি লাগবে কেন?”

“ভূত! ভালো বলেছ। হ্যাঁ আমি এখন একেবারে ভূত বা অতীত। তবে কোনো পিছু টান থাকলে বা মায়া থাকলে যাওয়ার পথটাও অমসৃণ হয়ে যায়। আমারও ঠিক সেই দশা।”

মলয় মুচকি হেসে বলল, “তোমার মাদুলি কি তোমাকে আবার জ্যান্ত করে দেবে?”

“না তা নয়। তবে ওটা আমার দরকার। জীবিত অবস্থায় যে কাজটা করে যেতে পারিনি, অশরীরী হয়ে সেটা করতে হবে।”

“আমি কি জানতে পারি কি কাজ? আর তুমি তো নিজে নিজেই আত্মহত্যা

করেছ। তাহলে এখন আফসোস করছ কেন?"

"তোমার জেনে কি হবে? তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?"

"যদি বলি পারব।"

"তুমি পারবে, সত্যি?"

"হুম... তবে আগে সবটা শুনি।"

মেয়েটি বলল, "আমি প্রত্যুষা সেন। মাসতুতো দাদা বৌদির সংসারে থাকতাম। নিজের বলতে আর কেউ ছিল না। দাদা আমাকে দিয়ে জোর করে খারাপ কাজ করিয়ে টাকা রোজগার করত। মাসি মারা যাওয়ার আগে আমাকে একটা মাদুলি দিয়েছিল। ওটাই আমার একমাত্র সম্বল ছিল।"

"হা হা... ভূতের আবার শেষ সম্বল!"

"তোমার কাছে ব্যাপারটা হাসির মনে হলেও তেমনটা নয়। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি মানুষটা নেহাত খারাপ নও। তোমাকে সবটা বলতে পারি, আর এছাড়া এখন আমার কোন উপায় নেই। আমার কাছে যে মাদুলিটা ছিল সেটা শুধু মাদুলি নয়, মাদুলির ভিতরে একটা কাগজ আছে। সেই কাগজে একটা হেঁয়ালি লেখা আছে। সেই হেঁয়ালির সমাধান করতে পারলে আমি অনেক টাকা-পয়সা, সোনা পাব। আর ওই মাদুলিতে একটা ম্যাগনেট আছে, যা ওই গুপ্ত সম্পদের চাবিকাঠি।

আসলে আমার দাদা বৌদি খুব লোভী। তারা নিজে-দের স্বার্থের জন্য সব কিছু করতে পারে। মাসির ওপর জোরজুলুম করতে করতে মাসি মারা যায়। কিন্তু মাসি ওই লোভীদের তার গুপ্ত সম্পত্তির কানাকড়ি দিতে নারাজ ছিল। কারণ তার ইচ্ছা ছিল সেই অর্থ কোনো সৎ কাজে ব্যবহার হোক। তাই আমাকে ওই গুপ্ত সম্পদের ঠিকানাটা মাদু-লিতে ভরে দেয়। যাতে বাকি কেউ জানতে না পারে। কিন্তু শকুনের চোখকে ফাঁকি দেবে কে? দাদা একটা কিছু আন্দাজ করে ফেলে। আমার উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয় না দেখে, আমাকে খুন করে – আর সবার কাছে বলে এটা আত্মহত্যা। যতদিন না মাসির অপূর্ণ ইচ্ছাটা পূরণ করছি, আমার আত্মার শান্তি নেই। কিন্তু এখন কোথায় পাবো মাদুলিটা বুঝতে পারছি না।”

বৃষ্টি এতক্ষণে থেমে গিয়েছে। আকাশ ভর্তি তারার জলসাঘর বসে গেছে। মলয়ের মনের কোণেও তারার মতো আশার বিন্দু জ্বলজ্বল করে উঠল। মলয় পকেট থেকে একটা কাগজের খাম বের করে বলল, দেখত এই কাগজের খামের ভিতরের মাদুলিটা তোমার কিনা?

প্রত্যুষা একরাশ উৎসাহের সাথে কাগজটা

ধরতে গেলো। কিন্তু এ কি ও কোনো ভাবেই কাগজটা ছুঁতে পারছে না। বারবার চেষ্টা করেও, কোনোভাবেই ও কাগজের খামটা ছুঁতে পারে না। মলয় ওর মনের অবস্থাটা ভালো ভাবেই আন্দাজ করতে পারে। আর সাথে এটাও আন্দাজ করে যে অশরীরী হওয়ার জন্য ও কোনো ভাবেই জাগতিক বস্তু ছুঁতে পারছে না।

তাই মলয় নিজেই খাম থেকে মাদুলিটা বের করে ওকে দেখায়। মাদুলি দেখে প্রত্যুষার মুখের নিরাশার কালো আঁধার কেটে যায়। সে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই। এর ভিতর একটা কাগজের টুকরো আছে। তাতেই সেই হেঁয়ালি আছে। কিন্তু..."

"কিন্তু কি?"

"আমি তো আর কোনো জিনিস স্পর্শ করতে পারছিনা। তাহলে আমি এ কাজ সম্পূর্ণ করব কি করে?"

মলয় মনে মনে ভাবে সত্যি তো মেয়েটা ঠিক বলেছে। মলয় আরো ভাবে যদি ও মেয়েটাকে সাহায্য করে তাহলে মোটা টাকা গয়নাগুলো হাতিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সাহায্য করার কথাটা বলবে কি করে সেটা ও বুঝতে পারছিল না। কি বলবে মলয় সেটাই ভাবছিল, ঠিক এমন সময় প্রত্যুষা নিজেই বলে উঠল, "আমি খুব নিরুপায়। তুমি

কি আমাকে এই কাজটা করতে সাহায্য করতে পারবে? আমি জানি এই কয়েক ঘণ্টার আলাপে এমন অনুরোধ করা যায় না। তবু যদি... তোমাকে দেখে খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে...”

ভোরের প্রথম আলোর আভা ফুটতেই, প্রত্যুষা কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো। মলয় এদিক ওদিক দেখে – কিন্তু কোথাও সে নেই। এদিকে কখন থেকে যে নদীর পারে পাঁচু এসে দাঁড়িয়েছে, তা ও লক্ষ্য করেনি।

পাঁচু বলে, “আরে ও মলয়দা একা একা কার সাথে কথা বলছো? কেউ তো নেই। বলি নেশার ঘোর কি কাটেনি?”

মলয় ইতস্তত হয়ে সামনে তাকিয়ে দেখে – পাঁচু দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচু কিছু সন্দেহ করেছে কিনা সেটা অনুমান করতে না পেরে, প্রত্যুষার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে ও বলে, “হ্যাঁ রে পাঁচু মনে হচ্ছে কাল রাতে একটু বেশি ডোজ পড়ে গিয়েছিল পেটে, তারই জন্য মনে হয় এই বেশি বকছি। চল বাড়ি যাই আমি। দেখি আজ কি ঝামেলা অপেক্ষা করছে। এই অভাবের সংসার আর ভাল লাগে না রে পাঁচু। জীবনে কিচ্ছুই পেলাম না।”

মলয় বাড়ি গিয়ে নাওয়া খাওয়া সেরে ঘরে এসে বসল। ওর মনে একটা প্রশ্নই জাগছিল বারবার – যে কাল রাতে যা দেখেছে,

শুনেছে, সেটা কি সত্যি! অনেকক্ষণ ভাবার পর ওর মনে হলো সত্যি কি মিথ্যে তা একমাত্র এই মাদুলিটাই বলতে পারে। জামার বুক পকেট থেকে কাগজের খামটা বের করে, তারপর খাম থেকে মাদুলিটা বের করে দেখতে থাকে ও। মাদুলিটার ভিতর থেকে একটা চিরকুট বেরোয়। কাঁপা কাঁপা হাতে চিরকুট খুলে ও দেখে ওতে লেখা আছে – "যদি এ হেঁয়ালি জানতে চাস / হয় যদি বনচাড়ালের চাষ। / মেটাতে মনের আশ্বাস, / ঘুরে ফিরে চারিদিকে তাকাস / মায়ের বুকে স্নেহে বেড়ে ওঠে ঘাস / সময় আছে যদি হয় বিশ্বাস / কাটবে সকল ফাঁস।"

মলয় হেঁয়ালি পড়ে হেসেই ফেলে, কিন্তু সাথে সাথে ওর মনে একথারও উদয় হয় যে কাল রাতে মেয়েটি সত্যি কথা বলেছিল। কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ কীভাবে উধাও হয়ে গেলো আর কেন – তা ও বুঝতে পারে না। আর যদি তার কথা অনুযায়ী এই চিরকুট অর্থ-সম্পত্তির খোঁজ দেয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু তার আগে এই হেঁয়ালির মানে জানতে হবে। আর যেটা ওই মেয়েটা ছাড়া সম্ভব নয়। ও কি করবে ভেবে পায় না। একবার ভাবে চিরকুটটা ফেলে দেবে – সব বেকার, আবার ভাবে এই চিরকুট যদি ওকে ধনী করে!

ওকে আর এই অভাবের জ্বালা ভুগতে হবে না। তাই ও চিরকুটটা আবার মাদুলিতে ঢুকিয়ে রাখে।

রোজ রাতের মতো সে রাতেও মলয় আবার নেশায় চুর হয়ে যায়। তখন প্রায় মাঝরাত, বাতাস একবারে স্থির। এ দুর্যোগ আসার পূর্বাভাস। মলয় আবার অনুভব করল সেই আগের দিনের শীতল স্পর্শ। ও উদগ্রীব হয়ে উঠে, নেশার ঘোরে বলল, "বিরক্ত করিসনা পাঁচু, ঘরে যা..."

পিছন থেকে আওয়াজ এলো, "না, আমি পাঁচু নই। আমি প্রত্যুষা।"

মলয় সঙ্গে সঙ্গে পিছন ঘুরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "আজ ভোরে কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমি তো ভাবলাম আর দেখা হবে না।"

"আমি অন্ধকার জগ-তের মানুষ, আলোতে আসতে পারি না। মাদুলিটা কোথায় দাও।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি।" এই বলে পকেট থেকে মাদুলিটা বের করে দিতে গিয়ে মলয়ের মনে পড়ে যায় আগের দিনের কথা। ও বলে, "তুমি তো মাদুলিটা ছুঁতে পারবে না, আমি বলছি চিরকুটে কি লেখা আছে।"

"না না লেখা পড়ার দরকার নেই, সেটা আমার আগেই পড়া। দরকার তো খুঁজে বার করা।"

"হুম, তা এটা কোথায় থাকতে পারে বলে তুমি

মনে করো?"

"কোথায় আছে জানলে কি কাজটা ফেলে রাখতাম? না জানিনা, তবে এইটুকু জানি পুরানো জলার আশেপাশে হবে।"

"পুরানো জলা? সেটা আবার কোথায়?"

"আমাদের বাড়ির পিছনে যাবে?"

"এখন?"

"হ্যাঁ, আমার হাতে সময় কম।"

মলয় একটু ভেবে বলল, "দাঁড়াও, আমার কিছু কাজ আছে তা সেরে আসছি। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করো।"

রাতের অন্ধকারে প্রত্যুষা তাকে নিয়ে গেলো তার বাড়ির পিছনের পুরানো জলায়। তারপর দুজনে শুরু করে জলা জমিতে গুপ্ত সম্পদের অন্বেষণ। কিন্তু দুজনেই না পায় গুপ্ত সম্পদের হদিস, না বোঝে হেঁয়ালির মানে। ওরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে যাবে ঠিক সেই সময়ে মলয়ের নজর পড়ে বনচাড়াল গাছের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চিরকুটটা খুলে সে পড়তে শুরু করে - "যদি এ হেঁয়ালি জানতে চাস / হয় যদি বনচাড়ালের চাষ। / মেটাতে মনের আশ্বাস, / ঘুরে ফিরে চারিদিকে তাকাস / মায়ের বুকে স্নেহে বেড়ে ওঠে ঘাস / সময় আছে যদি হয় বিশ্বাস / কাটবে সকল ফাঁস।"

এই তো বনচাড়াল। এবার চারিদিকটা ঘুরে

যদি তাকাই... তারপর "মায়ের বুকের স্নেহে বেড়ে ওঠে ঘাস/ সময় আছে যদি হয় বিশ্বাস"

এটা কি বোঝাচ্ছে?

প্রত্যুষা বলে, "আচ্ছা মায়ের বুকের স্নেহ, মানে মাটিকেও তো 'মা' বলে, আর দেখো এখানে সবুজ ঘাস ভরা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ, কিন্তু তারপর কি?"

"সময় আছে যদি হয় বিশ্বাস... এটা কি হবে?" প্রত্যুষা বলে।

মলয়ের মাথায় কিছু আসে না। এদিকে একটু একটু করে ঝড় উঠতে শুরু হয়। প্রত্যুষা বলে "আকাশের অবস্থা ভালো নয়। যদি তাড়াতাড়ি এখান থেকে যাওয়া না যায়, তাহলে তো তোমারই বিপদ। চলো, আমরা ওই সামনের ভাঙা বাড়িটার ভিতর গিয়ে দাঁড়াই।" দুজনে ওই বাড়ির নীচে প্রায় ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে বৃষ্টি থামল। হঠাৎ করে ভাঙা বাড়িটার দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় ঘড়ির ঘন্টা ঢং ঢং করে বেজে উঠল। দুজনেরই চোখ গিয়ে পড়ল সেই ঘড়িটার ওপর।

মলয় উৎসাহের সাথে বলল, "আমি যা ভাবছি আমার মনে হয় তুমিও তাই ভাবছ। ওই দেখো বনচাড়াল থেকে ঘাসে ঢাকা রাস্তা চলে এসেছে এই বাড়ির সামনে পর্যন্ত। আর এই যে দেখছ ঘড়ি মানে – সময়, মিলল তো?

তার মানে এই ঘড়ির এখানেই আছে। কিন্তু কোথায়? চারিদিকটা একে-বারে ভাঙা আর ফাঁকা।”

“আচ্ছা এই ঘড়ির পিছনে থাকতে পারে?” প্রত্যুষা বলল।

“হ্যাঁ তুমি এটা ভুল বলোনি। চলো, ঘড়িটা নামিয়ে দেখি।”

ঘড়িটা নামিয়ে এক পাশে রেখে, ওরা দেখল একটা ম্যাগনেট দেওয়া সিন্দুক। দুজনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো।

প্রত্যুষা মনে মনে ভাবল এবার তার মাসির স্বপ্ন পূরণ হবে। আর ওই থেকে কিছু জিনিস সে মলয়কে দেবে। কারণ তার সাহায্যের জন্যই এটা সম্ভবপর হয়েছে।

এদিকে মলয়ের মনে চলছিল অন্য চিন্তা। সে নিজের বুক পকেট হাতড়ে বলল, “এই রে মাদুলিটা মনে হয় ওই জঙ্গলেই পড়ে গেছে, একটু দাঁড়াও আমি দেখছি।”

প্রত্যুষা বলল, “আমিও তোমার সাথে খুঁজতে যাচ্ছি।”

“তুমি বরং ওই জলার কাছে দেখো, আমি এই জঙ্গলের দিকটা দেখছি।”

“সেই ভালো”

প্রত্যুষা তো জানতই না যে মলয় ওখানে মন্ত্র তন্ত্রের বলে একটা অদৃশ্য বাঁধন দিয়ে রেখেছে। ও এক শ্মশানবাসী সাধুর কাছে এই সব মন্ত্র সাধনা শিখেছিল, ভন্ডামি করে টাকা রোজগারের জন্য।

আজ সত্যি সেটা কাজে লেগে গেলো। প্রত্যুষা ওই বাঁধনে পা দিতেই আর ওখান থেকে বের হতে পারল না। তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেলো।

এদিকে মলয় নিজে সব দখল করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে আবার গেলো। এরপর ঐ মাদুলির চুম্বক দিয়ে ও সেই সিন্দুকটা খুলে ফেলল। এখন এইসব ঐশ্বর্য শুধু ওর। এবার ও ধনী হবেই। ওর চোখে মুখে একটা লোভের হাসি ফুটে ওঠে। সব সোনাদানা নিয়ে ও বাড়ি চলে এলো।

অতি সতর্কতার সাথে মলয় সব গয়না একটা পুঁটলি করে টিনের বাক্সে রেখে দিলো। তারপর ভোরের দিকে পান্তা খেয়ে, ও একটা নিশ্চিন্তের ঘুম দিলো। ও জানে ওকে আর ডোমের কাজ করতে হবে না। এই মনিমানিক্য ওকে ধনী করে দেবে আর কোনো অভাব থাকবে না।

বেলায় উঠে মলয় শ্মশানে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, আর মনে মনে ভাবছে এই ওর শেষ ডোমের কাজ। এরপর মা আর বোনকে নিয়ে ও অনেক দূরে চলে যাবে। কারণ এখন ওর অনেক টাকা। বেরোনোর আগে ওর মনে হলো পুঁটলিটা খুলে একবার ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। পুঁটলি খুলে ও দেখল সত্যি ভাবনাতীত কত গয়না,

টাকা। তারপর ও দেখে মুক্তোর হারটার মাঝে কি যেন একটা চকচক করছে! মুক্তোর হার সরিয়ে ও দেখে সুন্দর কারুকার্য করা একটা ছোট্ট বাক্স। কিন্তু অনেক দিন থেকে থেকে বাক্সটা একবারে এঁটে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও খুলতে না পেরে বিরক্ত হয়ে, ও বাক্সটা মেঝেতে ফেলে বাকি গয়নাগুলো আবার পুঁটলি করে একটা টিনের বাক্সে তুলে রাখল।

মনে মনে ও এটাও ঠিক করে নিল যে শ্মশান থেকে একটু ঘুরে শহরের দিকে একটা ফ্ল্যাট দেখতে যাবে। যাবার সময় ও মাকে বলল, "মা এবার আমরাও বড়লোক হব।"

মা ওর মুখের দিকে হাঁ করে দেখে আর ভাবে কোন্ লোভের আগুন জ্বলজ্বল করছে তার ছেলের চোখে মুখে।

মলয় শ্মশানে একটু ঘুরে, শহরে যায়। কয়েকটা ফ্ল্যাট দেখে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। তাই ফিরতেও ওর আরও বেশি দেরী হয়। কিন্তু ফিরে এসে ও যা দেখে তাতে ওর প্রাণ হাতে চলে আসে। গঙ্গার বানে ওদের বাড়ি, ওর মা-বোন সব জলের তলায় তলিয়ে গেছে। কিছুর চিহ্ন নেই। মলয় গঙ্গার পাড়ে ধপ করে বসে পড়ে। কিছুতেই ও মানতে পারে না যে এই ভাবে সব শেষ হতে পারে।

সারা রাত ও পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি করে। কিন্তু না, সব হারিয়ে ও এখন একেবারে সর্বহারা। না রইল আপনজন, না রইল সেই পুঁটলি।

ভোরের আলো ফুটল, সব সেই একই রকম – শুধু মলয় নিঃস্ব। ও দেখল পাড়ে ওর পায়ের কাছে সেই কারুকার্য করা বাক্সটা পড়ে আছে। মলয় বাক্সটা হাতে নিয়ে দেখে যে বাক্সটা আলগা হয়ে গেছে। ও বাক্সটা খুলে দেখে তাতে ভর্তি মাটি। ও মনে মনে হাসে আর ভাবে ভাগ্যের কি পরিহাস?

সারাদিন বসে বসে ও একটাই কথা ভাবে এটা কি ওর পাপের ফল? প্রত্যুষার মতো একটা নিষ্পাপ আত্মাকে ঠকানোর ফল কি এটা?

বিকালে ও সেই পুরানো জলার কাছে আবার যায়। যেখানে প্রত্যুষাকে বন্দি করে রেখেছিল, সেখানে গিয়ে হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা, তাকে ও আর কোথাও খুঁজে পায় না।

ব্যর্থ সৈনিকের মতো জলার ধারে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে মলয়। হঠাৎ পিছন থেকে ও প্রত্যুষার গলার আওয়াজ শুনতে পায়।

“তুমি কাঁদছ কেন? ভেবেছ আমি হারিয়ে গেছি? ওইটুকু মন্ত্রে কি আমায় বন্দি করা যায়? হ্যাঁ, শুধু কিছুক্ষণের জন্য

আয়ত্তে রাখা যায়। আমি তো কখন বাঁধন থেকে বেরিয়ে গিয়েছি। তবে তুমি এটা নাও করতে পারতে। আমি তোমাকে এর ভাগ থেকে বঞ্চিত করতাম না।"

মলয় আর কিছু বলতে পারে না, শুধু হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও। আমার পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি। আমার সব ভেসে গেছে। আর কিছু বাকি নেই। আমি তোমার জিনিস নিয়ে খুব বড় অপরাধ করেছি। আসলে আমার লোভ আমাকে এমন কুকর্মের পথে ঠেলে দিয়েছে। শুধু একটাই আফসোস তোমার জিনিসগুলো যদি তোমাকে ফেরত দিতে পারতাম, আমার পাপের বোঝা বোধহয় একটু হলেও কম হতো।"

"তুমি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ এটাই অনেক। আর আমিও কিছু ভুল করেছি।"

"ভুল! তুমি আবার কি ভুল করেছ?"

"ভুল করিনি? ইহলোক ছাড়ার পর জাগতিক বস্তুতে মায়া রাখতে নেই। কিন্তু আমি সে মায়া রেখেছি। এটাই আমার ভুল। আমি নিশ্চিত ঐ সম্পদ জলে ভেসে ভেসে খুঁজে নেবে নিজের ঠিকানা। আমরা কে বলো এইসব ঠিক করার?"

"হ্যাঁ ঠিক বলেছ। তবে

তোমাকে আমার একটা জিনিস দেওয়ার আছে।”

“কি?”

“জলে সব ভেসে গেলেও এই ছোট্ট কারুকার্য করা মাটি ভরা বাক্সটা রয়ে গেছে। তুমি এটাই নাও।”

“ওটা তুমি তোমার কাছেই রাখো আমার স্মৃতি হিসাবে। আমার আর কিছুর প্রতি মায়া নেই। আমি এলাম। তুমি নতুন করে জীবনটা শুরু করো। হয়তো সব শেষ থেকেই নতুন কিছু শুরু হবে!” এই বলে প্রত্যুষা হাওয়ার সাথে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেলো।

মলয় বাক্সটা বুকে জড়িয়ে সামনের জনহীন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল আগামী দিনের খোঁজে... ■

একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকা হলেও, শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায়

‘গুঞ্জন’

আজ পৌঁছে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। আশা রাখি আপনিও পত্রিকাটি শেয়ার করে দেবেন। ‘গুঞ্জন’-এর পরবর্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে অক্টোবার মাসে। লেখা পাঠানোর অন্তিম তারিখ – সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪।